অ-রাজনীতিকরণের রাজনীতি

জয়ন্ত কুমার ঘোষাল

চোখ বুজলেই দুটো ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। প্রথম ছবিটা বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার। তৎকালীন সেন্ট পিট ার্সবুর্গের রাস্তায় দৃপ্তভঙ্গিতে মিছিলে হাঁটছেন জনকয়েক মানুষ। স্লোগান ছিল দুনিয়াটা তাঁরা বদলাবেনই। আশপাশের লোকজন হয়তো হাসছিল। সেই হাসিকে মিথ্যে প্রমাণ করে কয়েকবছরের মধ্যে সংগঠিত হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তকারী বিপ্লব। পরের ছবিটা আমার মত অনেকে দেখেছেন দূরদর্শনের পর্দায় বা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। প্রায় পঁচাত্তর বছর কমিউনিস্ট শাসনে কাটানোর পর সেই সোভিয়েত ইউনিয়নে একের পর একভেঙে দেওয়া হচ্ছে মার্কস লেনিনের মূর্তি। সরকারি দপ্তর থেকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে লাল পতাকা। তিরিশ কোটির বেশি মানুষের দেশ সো ভিয়েত ইউনিয়নে সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল তিন কোটির উপর,বিভিন্নগণসংগঠনের সদস্য ধরলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন মানুষের সংখ্যাটা ছিল বিশাল। অথচ কেউ একটা গলা তুলে প্রতিবাদ জানাল না। সর্বে াপরি রাষ্টক্ষমতায় ছিল সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগে পূর্বইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে একই অবস্থা। পার্টিগুলি প্রথমে বাধ্য হয়েছে নিজেদের নাম পাল্টাতে, তারপরে গোটা সরকারি ব্যবস্থাটা পাল্টে গেল। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ মনের যন্ত্রণা নিয়ে গুমরে মরে।

চলে আসা যাক নিজের ঘরে। ১৯৬৭। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা নির্বাচনের পর নানা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এসে গঠিত হয়েছে। আগের রাজনৈতিক ইতিহাস যাদের মনে আছে, তাঁরা জানেন কিভাবে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কংগ্রেস বিরে াধী পরস্পর যুযুধান দুই ফ্রন্ট জনগণের চাপে একসঙ্গে মিলে মন্ত্রীসভা তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭৭। কেন্দ্রে একদলীয় শাসনের অবসান ঘটল নির্বাচনের ফলাফলে। অভ্যন্তরীণ জরি অবস্থার রক্তাক্ত অন্ধকারময় দিনগুলি পেরিয়ে নতুন অবস্থা তৈরির কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয়, তা দিতে হবে ভারতের জনগণকে। একেবারে হালফিলের ২০০৪ নির্ব াচন। মানুষের রাজনৈতিক সচেতনার পরিচয় আবার পেলাম।

মানুষ সচেতনভাবে নিজের মনের মধ্যে নিজের মত করে লালন করে রাজনীতির ধারণা। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাকে পোষণ করে অগ্রণী ভূমিকা নেয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ তার অঙ্গ। মানুষের যেসব মানসিকতা, তেজস্বি তা, ভাবোদ্দীপনা, মেজাজ ও মূল্যবোধের সমষ্টি যখন কোনও জাতি বা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচার বিচার বিশ্বাস আর প্রবণতাকে একত্রিত করে সেটাকে আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে পারি। আরিস্তোতল এক ধরনের মনোজগতের কথা বলেছিলেন যার প্রতিফলন ঘটে বিপ্লবে কিংবা রাষ্ট্রীয় স্থিতাবস্থার মধ্যে। ইতি হাসবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের অ াচরণের পিছনে জাতীয় চরিত্র ও ঐতিহ্যের প্রতিফলনের কথা বলেন। রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে সমাজতত্ত্ব, সামা জিক মনস্তত্ত্ব, পরিসংখ্যান ইত্যাদি জানা বোঝার প্রয়োজন আছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আবেগ অনুভূতির মিশ্র ণে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ঠিক ভুল, রাজনীতি ক্ষেত্রের ভাল মন্দ - এসব একত্রে মূল্যবোধের ধরন গড়ে তোলার প াশাপাশি পালনীয় রীতিনীতির বা ঔচিত্যের মান ঠিক করে দেয়। সমাজের গুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলি র াষ্ট্রের সামগ্রিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আর রাজনীতির প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত ও য

াবতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। জনসমাজের নানা মূল্যবোধ দেশের ইতিহাস, সামাজিক গঠন, প্রকৃতি ঐতিহ্য এবং প্রশাসনের কাজকর্মের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রূপায়িত হয়। রাজনৈতিক কাজকর্মকে কোনো কোনো দেশে মানুষ সর্বসম্মতভাবে মেনে নেয়। অনেক দেশে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে বিপক্ষে নানা পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে। শেষপর্যন্ত কোনো একটি ধারায় স্থায়ী যে বিধিব্যবস্থা গৃহীত হয় সেগুলি একটি সংবিধানের মধ্যে দিয়ে রূপা য়িত হয়। রাজনৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রত্যাশা থাকে। বিভিন্ন দেশে মানুষের বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে থাকে আইনের শাসন ও সরকারের জনহিতকর ক াজকর্মের জন্য প্রত্যাশা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোন নিশ্চল মানসিকতা নয়। নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, আদর্শ, শিল্পোন্নয়ন, প্রভাবশালী নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব, জনসংখ্যা তথা জনবিন্যাসের পরিবর্তন---এসব নানা কারণে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সর্বদা একরকম নাও হতে পারে। একটা বিশাল দেশের অন্তর্গত নানা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিগত জনসমষ্টি বা জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমান না হতে পারে। আবার দেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির আ ধিপত্য রয়েছে তার স্রষ্টাহতে পারেন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতারা এবং সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সংস্কৃতি থেকে আলাদা হতে পারে।

অন্যদিকে মার্কিন মূলুকে একধরনের রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বাস চালু আছে। যার অর্থ হল প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের সাংস্কৃতিক মানসিকতা গ্রহণ করে। সংস্কৃতিকরণের এই প্রক্রিয়া একই দিকে প্রবাহিত হয়। তার ফলে একটি সংস্কৃতির মধ্যে অন্য একটি সঞ্চারিত হয়। এরা পরস্পরের অভিমুখে প্রবাহিত না হওয়ায়, কোনও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না। যা বিপজ্জনক বহুত্ববাদী এক সমাজে। সব মিলিয়ে যেতে পারে সংস্কৃতিকরণের প্রক্রিয়া যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল র াজনৈতিক সংস্কৃতি। তা সমাজ, জাতি, পরিবেশ, জনসংখ্যা, স্থানীয় দেশজ বৈশিষ্ট্য সবকিছু নিয়ে গড়ে ওঠে। কখনই তা স্থিতিশীল নয়, বরং প্রচণ্ড গতিশীল। যা দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতেএক গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের ম ানসিকতা এর সবচেয়ে বড় নিয়ন্তা।

আবার নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক চেতনায় সবচেয়ে অনগ্রসব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যদি এই মানসিকতা ঢুকে যায় তাহলে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তারা নিজেদের সুবিধা অর্জনের জন্য এবং শ্রমজীবী মানুষ যাতে শ্রেণিসংগ্রামের পথে না যায় তার উদ্যোগ নেয়। যে ম ানসিক অবস্থায় রাজনৈতিক সমস্ত ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, মানুষ সেসব ব্যপারে যে নিরাসক্ত মনোভঙ্গি প্রকাশ করে তাকে আমরা রাজনীতি নিস্পৃহতা বলে থাকি। সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত ওইসব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিফলিত হয়। সেগুলিকে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়। সমস্ত সামাজিক উদ্দেশ্য ন া থাকলেও যদি তার রাজনৈতিক পরিণতি দেখা দেয় তাহলে দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। কোনও ব্যবস্থায় যদি সরকারের বিরোধিতাকে বেআইনি করা হয়, তাহলে রাজনীতিতে নিস্পৃহ ব্যক্তি বা সংস্থা তাদের কাজ বেশি করে করেন। কারণ তখন সেটাই হয়ে দাঁড়ায় বিরোধী প্রতিষ্ঠানিকতার প্রতিস্পর্ধী। অবশ্য সেই বিরোধিতার নানা ধরন থাকতে পারে।

মোটামুটি এইরকম এক তাত্ত্বিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যে গত সিকি শতাব্দীর বেশি সময় ধরে চর্চিত অর াজনীতিকরণের বিষয়টি আলোচনার জন্য হাজির করা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় রাজনীতি সচেতনতার জন্য যার অহংকার দীর্ঘদিনের সেখানে অরাজনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রথম এবং প্রধান কৃতিত্ব এই সিকি শতাব্দীর অধিক পর্বের নিরবচ্ছিন্ন শাসনের কৃতিত্বের দাবীদার প্রধান শাসক দলের।

মানুষের অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ কিছু বিষয় রয়েছে যার ওপর রাজনীতির জগতে অযোগ্য মানুষদের অযথা হস্তক্ষেপকে ত ারা ভাল চোখে নেন না। সাধারণ প্রশাসন --- মানুষ এখানে নিরপেক্ষতাও ন্যায়বিচার আশা করে,শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিশি ব্যবস্থা ---এ ধরনের যেসব বিষয় সাধারণ মানুষ যাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন রাজনীতি জগতের মানুষের ব্যাপক অনুপ্রবেশকে সাধারণ মানুষ অন্যভাবে দেখে থাকেন। কারণ হিসাবে বলা যায় এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা সাধারণত দলানুগামী হন এবং কাজের রূপায়ণে দলীয় স্বার্থের দিকটায় তাঁদের জোর পড়ে। অথচ কাজের সফল রূপ ায়ণ, মানুষের সামান্য কিছু উপকার করা যে প্রসারিত উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরপ্রত্যাশা করেন মানুষ বা তার প্রয়ে াজন রয়েছে এ সবের জন্য তার পরিচয় পাই না। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে

আমরা প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখছি। কিন্তু যেটা দেখতে পাই অথচ বুঝতে চাই না, ঘটে যাওয়া সেই বিষয়টি হল দেশের স্বাধীনতার পর এক ভাড়াটে শ্রেণি, সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় রেন্টাল ক্লাস এর আবির্ভাব হয়েছে জাতীয় জীবনে। অসাধু পেশাদার রাজনীতিক, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা, অসৎ বড় ব্যবসায়ী ও মাফিয়ারা এই শ্রেণির। দেশের রাজনীতি, সম াজনীতি, সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ এদের হাতে।। এদের অশুভ যোগাযোগ এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনেছে সমস্ত ক্ষেত্রে। মানুষ এদের প্রবল এবং অশুভ অস্তিত্বকে প্রতি মূহূর্তেউপলব্ধি করতে পারলেও কিছু করতে পারে না। কারণ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র য াকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু যারভয়ংকর অস্তিত্বকে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারেন, সেই রাষ্ট্রশক্তি এদের পেছনে রয়েছে। সাধারণ নাগরিক হাজার অসুবিধায় পড়লেও রাষ্ট্রের কাছে সুবিচার পাবে না, নির াপত্তার আশ্বাস পাবেন না। স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিমানুষ নিজেকে কিছুটা ভয়ে কিছুটা ঘৃণায় গুটিয়ে নেন। রাজনীতির কলুষিত অঙ্গন থেকে সরে দাঁড়ান। অরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়াটি শক্তিশালী হয়।

শিক্ষা মানুষের কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। শিক্ষাকে নিয়ে রাষ্ট্র মানুষের মনে যে মিথ তৈরি করে তাতে ম ানুষের চোখে শিক্ষা অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে থাকে। শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক চাপান উতোর মানুষের মনে রাজনীতি স ম্পর্কে এক ঘৃণার মনোভাব গড়ে তোলে। পশ্চিমবঙ্গে গত পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষাজগতের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যত অশালীন এক দলীয় নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যা কিছু অসাফল্য তার জন্য রাজনীতিকে দায়ী করার পাশাপাশি রাজনীতি সম্পর্কে ঘৃণাকেও জাগিয়ে তুলেছে। এ রাজ্যে শিক্ষার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অজস্র নিদর্শন রয়েছে। মানুষ তাকে মোটেই ভাল চোখে নেননি। সে কারণে এ রাজ্যের শিক্ষার গৈরিকীকরণের বিদ্ধে আন্দোলন ছাপ ফেলতে পারে না। গুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। শিক্ষায় দলীয় আ ধিপত্যের ব্যাপারে রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে উচচ শিক্ষা সংসদ পর্যন্ত সর্বস্তরে দলানুদাসদের বসানো হয়েছে। যোগ্যতার কোন নিরিখ কেউ জানে না। একে শিক্ষার অঙ্গনে রাজনীতির কলুষিত হাতের ছোঁয়া বলে মনে করেছেন রাজ্যবাসী।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টি ধরা যাক। যে রাজনৈতিক একাগ্রতা, দৃঢ়তা এই কাজটির সাফল্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের শাসক দলগুলির মধ্যে তার একান্ত অভাব। এ রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে সাক্ষরতা প্রসারের কাজে তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসেনি। এ বিষয়ে সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার গরমিল অনেক। শিক্ষ াক্ষেত্রে কি যে ঘটনা ঘটছে তা বোঝার জন্য সাম্প্রতিককালে দুই প্রাক্তন উপাচার্যের কাণ্ডকারখানার উল্লেখ যথেষ্ট। তবে একটা বিষয় একজন জালিয়াতি করার জন্য জেল খাটেন, অন্যজন প্রধান শাসক দলের ও রাজ্যের সরকারি প্রধানের অ াশ্রয়ে থেকে জালিয়াতি করেও বহাল তবিয়তে বুক ফুলিয়ে বেড়ান আর এসব দেখে বিবেকবান মানুষ নিজেদের র াজনৈতিক নোংরামো (তাঁদের ভাষায়) থেকে দূরে সরিয়ে নেন। দলীয় অফিস থেকে ঠিক হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। যে াগ্যতার চেয়েও দলীয় আনুগত্যের প্রশ্নটা বড় সেখানে।

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকে শিবতরাই আর উত্তর কূটের মানুষদের মনে আছে তো! সমাজবিজ্ঞানীরা তো একধরনে ম ানুষদের ভাগ করেছেন পিপল আর ক্রাউড হিসাবে। উভয়ের স্বরূপ লক্ষণে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও বুনিয়াদে অমিল অনেক। শিবতরাই আর উত্তর কূটের মানুষ এই পিপল আর ক্রাউড-এর নিদর্শন। একদল সরল সাদাসিধে মানুষ ক্ষমত ালোভী রাজনীতিকরা যাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা করে। ক্রাউড এর লক্ষণের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের অন্ধ আনুগত্য ক্ষমতার কেন্দ্রের প্রতি। বিচারবোধহীন আনুগত্যের নিদর্শন রেখে এরা শাসকদের অনুগ্রহভাজন হতে চান। সংশয়, জিজ্ঞেসা এদের মনের মধ্যে ঠাঁই পায় না। শেকসপিয়ারের জুলিয়াস সিজারনাটক স্মরণ করা যেতে পারে। এদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ডাকে মাঠে ময়দানে যাঁরা ভিড় জমান, এই ক্রাউড গোত্রভুক্ত করা যেতে পারে তার বেশিরভাগ অংশকে। আসলে এই রাজনীতির ব্যবস্থায় পিপল এর স্থান নেই। বিশাল সংখ্যক পিপল, জানেন বোঝেন যাঁরা, নিজেদের সরিয়ে রাখেন নানাধরনের রাজনৈতিক উতোরচাপান থেকে। বছরে একবার বা দুবার নিয়মমাফিক বা সংস্কারবশত তথ াকথিত পবিত্র কর্তব্য পালন করে আসেন নির্বাচনের বুথে গিয়ে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশ মুখ সরিয়ে নিচ্ছেন সুশীল সমাজের বাসিন্দারা। বিষয়টির প্রতি তাঁদের বীতশ্রদ্ধতাও প্রকাশ পাচ্ছে। আশংকাটা এইখানে যে বিকল্প কিছুর সন্ধান ম ানুষ এখনও পাননি। ফলে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হতে চলেছে।

রাজনৈতিক শূন্যতা বলতে আমরা জনগণ বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলছি। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে জনগণের যেটুকু অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে সেটুকুও আর থাকছে না। বলা ভালো সচেতন মানুষ যাঁরা রাজনীতির মধ্যেসামান্যতম আদর্শবাদের আর কিছু অবশিষ্ট দেখেন না তাঁরা নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর আখড়ায় ভিড় জমাচ্ছেন ব্রাউডেরা। এদের দিয়েই ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করা রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কাজ হাসিল করে। আমাদের দেশে স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির যে কাঠামোগত বিন্যাস--- পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট---তার থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেছে ভারতীয় পিপল -এর। বছর দুয়েক আগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালনামে একটি সংস্থা তার রিপোর্টে জানিয়ে ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের সামান্যতম বিশ্বাসযোগ্যতা নেই জনগণের চোখে।

রাজনৈতিক দলগুলোর এক ঢিলেঢালা ভাবের সুযোগে দলে ঢোকে সমাজবিরোধীরা। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ণের যে প্রক্রিয়া সত্তর দশকের মাঝামাঝি শু হয়েছিল আজ তা শাঁসে জলে বেড়ে উঠে রাজনীতি ও দুর্বৃত্তগিরিকে একাকার করে দিয়েছে। দুষ্কৃতী ও দুষ্কর্ম আজকের রাজনীতিতে যেভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তা সুস্থ বিকাশের পথে বাধা। তা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ যাই হোক না কেন। আমাদের দেশে নানা পর্যায়ে --পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত কমপক্ষে দশ শতাংশ প্রতিনিধি নানাধরনের দুষ্কর্ম ও দুষ্কৃতীদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এ তথ্যকে সরকারও অস্বীকার করতে পারে না। দেশের সংসদে দাগী মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি তো ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাহাত্ম্যাকে প্রকাশ করে চলেছে প্রতিমুহূর্তে। পঞ্চায়েত ও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলিতে এদের রমরমা নানাভবে। এরা এদের পরিচালনাকে প্রভাবিত করে। দুষ্কৃতীরা নির্বাচনে হিংসাত্মক কাজকর্ম, বুথ দখল, রিগিং, ভোটদাতাদের ভোট দিতে না দেওয়া, ব্যালট বাক্সে কারচুপি, এখন ভোটের মেশিনের অপব্যবহার করে একদিকে যেমন মানুষকে আতঙ্কিত করে তেমনি বীতশ্রদ্ধও করে তোলে। বিরোধী প্রার্থীকে নির্বাচনে লড়তে না দেওয়ার জন্য ভয় দেখানো, খুন, জখন, নিখোঁজ করারও বিস্তর ঘটনা ঘটে। সমস্ত রাজনৈতিক দল কমবেশি এইসব দুস্কৃতীকে কাজে লাগায় এবং দুষ্কৃতীরাও নানাভাবে রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা পায়। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে তো বটেই, সাতাশ বছর বামশাসিত এ রাজ্যও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। অথচ রাজনৈতিক নেতারা এ ধরনের নানা কমিশন বসান। আবার কমিশনের রিপোর্টে তাঁদের বিদ্ধে কিছু লেখা হলেই চেপে দেবার ব্যবস্থা করেন। জনগণেরটাকায় বসানো কমিশনের এই পরিণতি মানুষকে রাজনীতি বিরোধী করে তোলে।

তবু রাষ্ট্রের ওপর মানুষের বিশ্বাস ভরসা অনেক। এর পেছনে মানুষের একধরনের অসহায়তা প্রকাশ পায়। আমাদের রাজনৈতিক সমাজ তার নিজস্ব অপরিপক্কতার কারণে নাগরিক সমাজের ওপর তার অশোভন আধিপত্যবিস্তার করে চলেছে। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিক বা সুশীল সমাজ যে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয় আমাদের দেশে তা অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় কারণ হল এদেশে নাগরিক সমাজ তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ঔপনিবেশিক আধারে তার জন্ম ও বিকাশ। আর ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ছত্রছায়ায় আমাদের রাজনৈতিক সমাজের যে বিকাশ ও বৃদ্ধি তা খঞ্জ ও খর্ব। স্বাধীনতাউত্তর আবাধউপনিবেশের বাস্তবে কি রাজনৈতিক সমাজ, কি নাগরিক সমাজ কারও কাছে সুস্থ চিন্তা পাওয়া যায় না। নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে যে বোঝাপড়া সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবহার অগ্রগতি ঘটায়, তা এদেশে নেই। সে কারণে নাগরিক সমাজের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে করতে পারেন না। অথচ তার উপর নির্ভরশীলতা বেড়েই চলে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এদেশেও রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী চরিত্র ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। সাধারণ মানুষের নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের আধিপত্য চাপিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন রয়েছে এ কাজে। ফলে মানুষ সুবিচার না পেলেও কোথাও যেতে পারে না। ফল হতাশা। নাগরিক সমাজকে গ্রাস করে এই সর্বগ্রাসী হতাশা।

এ রাজ্যে যে দলতন্ত্র সবকিছুর ওপর তার আধিপত্য কায়েম করেছে তার কুৎসিত চেহারা মানুষকে এক ভয়ানক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দল ও সরকার গ্রাস করেছে সমাজকে, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে স্বনামে ও বেনামে। ফলে মানুষ ক্রমশ তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আগে পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান ছিল। এরা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা করত, পাড়ায় মানুষের বিপতে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সাধারণভাবে মাঝারিমানের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা এইসব ক্লাব ইত্যাদি করত। পড়াশোনায় ভালো ছেলেরাও নিজেদের জড়াত। তাদের পেয়ে ক্লাবগুলোর যেমন লাভ হত, তেমন পাড়ার মানুষ, এলাকারমানুষও আনন্দ পেতেন। এইসব নান

াধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে পরবর্তীকালে নানা বিষয়ে যোগ্যরা বৃহত্তরপ্রেক্ষিতে নিজেদের ঠাঁই করে নিত। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র যুব সংগঠনে ক্যাডারদের একটা বড় অংশযেত এসব জায়গা থেকে নিজস্ব একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে। অথচ ক্লাব সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলত না। দলে যোগদানের বিষয়টি ব্যক্তিগত স্তরে থাকার জন্য সাধারণ মানুষের চোখে ক্লাবগুলি রাজনৈতিক দলের ঘাঁটি বলে মনে হত না। পাড়াভিত্তিক সিভিল সে াসাইটির নিজস্ব একটা প্যাটার্ন ছিল আমাদের দেশে।

অবস্থাটা পাল্টাতে শু করল সত্তরের দশক থেকে। ৬৯ এ রাজনৈতিক দলগুলির পাড়া দখলের অভিযান শু হল। এলাকা থেকে বিরোধী দলগুলোকে খেদানো হল। কোনো দলই সে ব্যাপারে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ফলে ব্যাপকভাবে সিভিল সে াসাইটির ধরনটা ভেঙে পড়ল। অথচ নতুন ধরনের কিছু গড়ে উঠল না। বন্ধহয়ে এল ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব কাজকর্ম। এবং চরম বেদনার কথা হল সেগুলি হয়ে গেল পাড়ার রাজনৈতিক দাদাদের বাতস্য দাদাদের হুকুম তামিলের আখড়া। পশ্চিমবঙ্গের তিনটে মফস্সল শহরের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। দেখেছি কি ভাবে নামি পুরনো ক্লাব গুলি নিজেদের কাজকর্ম শিকেয় তুলে স্থানীয় ক্ষমতাবানদের হাতে পুতুল হচ্ছে। ভোটের দিন আসল কাজের জন্য কালার টিভি, দামি ক্যারামবোর্ড কিনে দিয়ে, বেআইনিভাবে ক্লাব ঘরের পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়ে রাজনীতির দাদারা হাতে র াখেন পাড়ার উঠতি ছেলে ছোকরাদের। যাদের মূল কাজ বছরেওই একটা বা দুটো দিন। এদের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো কার্যত এক মোড়লতন্ত্র কায়েম করে যার সঙ্গে রাজনীতির, যা সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখায়, তার সম্পর্ক নেই। প াড়ার খেলার মাঠ দখল করে নেয় প্রোমোটর, জলা বুজিয়ে দেয় রাজনৈতিক দাদার যোগসাজশে। কলেজগুলো যেখানে ছ াত্র ইউনিয়ন, ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের রাজনীতিকরা উঠে আসতো তা এখন গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভা সিয়ে দিয়েছে। বহু ছাত্র -ছাত্রী চূড়ান্ত বেনিয়মি কোনও কাজ করার জন্য বা অন্যায় সুযোগ নেবার জন্য ছাত্র সংগঠনের সদস্য হয়। ছাত্র ইউনিয়নগুলো কোনও সৃষ্টিশীল কাজকর্মে আর তেমনভাবে মেতে উঠতে পারে না। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া দলীয়নির্দেশ তাদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে পদে পদে আটকে দেয়। রাজনীতির--- সে কি সরকারি পক্ষ কি বিরোধীর পক্ষ--- আঙিনায় নতুন মুখ আর দেখা যায় না। এই সুযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৰিবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের কর অ ারোপ করে ছাত্রদের উপর, অন্যায় হুকুম জারি করে। জানে ছাত্র ইউনিয়ন আর প্রতিবাদ করতে পারবে না। সামান্য যেটুকু করবে তা নিতান্ত লোক দেখানো। দু একজন হয়তো ইউনিয়নকে ধরে ব্যক্তিগত স্তরে কিছু সুবিধে নেবে। এদের মধ্যে ক-জন ভবিষ্যতে রাজনীতির আঙিনায় ঢুকবে তা না ভেবেই বলা যায়। শ্রমিকরাও একই ভাবে মুখ ফিরিয়েছেপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের নেতৃত্ব থেকে। কৃষি শ্রমিক তার মজুরি বৃদ্ধির লড়াইতে দেখে যে রাজনৈতিক নেতা তাকে উস্কানি দিলেন (সচেতন ভাবে কথাটা প্রয়োগ করা হল), তাঁর সঙ্গে মজুরি ফাঁকি দেওয়া জমির মালিকের গভীর দোস্তি। হয়তো বা দুজনেএকই দলের সদস্য, সমর্থক। পুঁজিবাদী সমাজে যে তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিসচেতনতা ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী --- এক কথায় নামাস্তরের মধ্য ও নিম্নবর্গের মানুষের মনে রাজনীতি সচেতনতা জাগাতে পারে, যে নিরবচ্ছিন্নশ্রে ণিসংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সচেতনতা জন্মায়, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ এর পর প্রধান শাসকদল র াষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখা তথা গদিতে আসীন থাকার স্বার্থে তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। শ াসকফ্রন্টের অন্যান্য দলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেবার জন্য মাঝে মধ্যে আন্দোলনের হুমকি দিলেও বড় দলের চাপে পিছু হটে। প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক মিত্র তাঁর আত্মজীবনী আপিলা চাপিলা-য় লিখেছেন কিভাবে রাজ্যের প্রথম বাম মুখ্যমন্ত্রী যিনি দীর্ঘকাল একটানা গদিতে থাকার রেকর্ড করেছেন, বিভিন্ন আন্দোলনের জঙ্গিরূপকে অপছন্দ করেছেন। বিভিন্ন আন্দে ালনের রাশ টেনে ধরেছিলেন বলে তিনি মনে করেছেন। মন্ত্রীসভায়থাকার সুবাদে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন বিষয়টিকে। ফলত সংগ্রামরত শ্রমিক কৃষক যেমন নিজেদের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে আন্দে ালনের পথ থেকে তেমনি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের মনে গড়ে উঠেছে এক নির্লিপ্ত মনোভাব। পাশাপাশি অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা দেখেছেন শ্রমিক কৃষক সম্মেলনে যে মন্ত্রী আগুন ঝরানো ভাষন দেন সংগ্রামের সময় তাঁর ভূমিকা গদির পক্ষে না সংগ্রামীদের পক্ষে অনেক উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের কাজকে শাসকদলের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হয়। আংশিক এবং অস্থায়ী সুবিধা পাওয়ার জন্য মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া যাকে আমরা সুবিধাবাদ বলি এর গর্ভে জন্ম হয় অর্থনীতিবাদের। আর সুবিধাবাদীরা সবসময় এবং সর্বত্র স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দেয়।

সন্ত্রাসের সামাজিকীকরণ এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে অরাজনীতিকরণের বিষয়টিকে শক্তিশালী করেছে। এর অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে রাজনীতির দূর্বৃত্তায়ণের দিক থেকে অগ্রসর বিভিন্ন রাজ্য যেমন বিহার, উত্তর প্রদেশ বা অন্যত্র রাজনৈতিক সন্ত্রাস নেই। সে সব রাজ্যে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা এক ধরনের বিশেষত উচচবর্গ যেভাবে নিম্নবর্গের উপর তার সন্ত্রাস চালায় আম াদের পশ্চিমবঙ্গে সে ধরনের সন্ত্রাস কম। যদিও এলাকা দখল নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষ, রাজনৈতিক হত্যার মাধ্যমে মানুষকে সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে ভয় দেখিয়েস্তব্ধ করা ব্যাপকভাবে রয়েছে। চাপা সন্ত্রাস য াকে চোখে না দেখলেও প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করা যায়, এখানে বিদ্যমান। এলাকার প্রধান রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা যিনি তাঁর কথাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষের মতামতের কোনও মূল্য নেই। সব ব্যাপারে তিনি যেমন শেষ কথা বলবেন, তেমনি মানুষের নানা ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভরশীল করে তুলবেন। ছেলেমেয়ের স্কুল কলেজে ভর্তি, হাসপাতালে ভর্তি, থ ানায় যাওয়া, সব ব্যাপারে তিনি এবং তাঁর বাহিনী সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। কার্যত গ্রাম্য মোড়লতন্ত্রের বিশ একুশ শতকীয় সংস্করণ। এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির কালচার আসলে এই মোড়লির কালচার। মার্কসবাদী, অ-মার্কসবাদী সবাই এই পথের পথিক।

এর পাশাপাশি রাজ্যের প্রধান শাসকদল বিভিন্ন সময়ে সমাজের কোনো কোনো অংশের বিদ্ধে গণঘৃণা বা বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলেন নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। প্রাক সাতাত্তর পর্বে এ রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতায় যাতেমন ছিল না। আম াদের সামনে অন্তত তিনটি অভিজ্ঞতা রয়েছে। শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা পঁয়ষট্টি থেকে ষাট এ নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার এবং প্রধান রাজনৈতিকদলের কর্মীরা সমবেতভাবে মানুষের মধ্যে শিক্ষকদের বিদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষক সংগঠন, যারা ওই রাজনৈতিক দলের শাখা, তারা শিক্ষকদের কোনও সহায়তা করলেন না। কিংবা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। একই পদ্ধতি তারা নিয়েছেন প্রাইভেট ট্যুইশনি বন্ধের ব্য াপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষকদের মধ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে। সত্তরের দশকের কালো দিনগুলিতে মস্তানরা শিক্ষককে হত্য া করেছে, অপদস্ত করেছে। কিন্তু তাদের সেই কাজের বিদ্ধে মানুষের তীব্র ক্ষোভ ছিল। মানুষ সুযোগ পেয়েই তার প্রতিবাদ করেছে। আর এখন মানুষের মনের মধ্যে শিক্ষক সম্প্রদায় সম্পর্কে ঘৃণা জাগানো হল। চরম অপমানিত শিক্ষকেরা এরপরও সেই দলের শিক্ষক সংগঠনে থাকলেও থাকাটা যে মোটেই আন্তরিক নয় তা বোঝা কঠিন নয়।

চিকিৎসকদের বিদ্ধে একইভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রধান শাসকদলের পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে সামাজিকঘৃণার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টাকে বোধ হয় এভাবে বলা যায় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে,বিশেষ করে চাকুরিজীবী বা রোজগেরে অংশের সঙ্গে অন্যান্য অংশের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের চেষ্টা অর্থাৎ রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার উদ্যোগ। সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ এদেশেররং বেরঙের শাসকগোষ্ঠীর সাধ ারণ মানুষের মধ্যে গন্ডগোল বাধানোর যে প্রয়াস তা এ রাজ্যের প্রধান শাসক দলেরও খেলা। উস্কানি দিতে গিয়ে এ র াজ্যের শাসকবর্গ যে কাজটি করেছেন তা হল রাজনীতি বা রাজনীতিকদের সম্পর্কে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা।

দেশের সব রাজনীতিক দল চায় রাজনীতি থেকে সাধারণ মানুষ দূরে থাকুক। রাজনীতি বলতে আমরা শ্রেণি রাজনীতি সচেতন মানুষ এই পুঁজিবাদী সমাজের বিদ্ধে তার প্রতিবাদ সংগঠিত করবে, সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবে--- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করা রাজনৈতিক দলের তার কাম্য নয়। রাজনীতি নিস্পৃহ মানুষের নীরবতা বরং তাদের কাছে অনেক স্বস্তিদায়ক। এই নৈঃশব্দ্যের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেসাহায্য করে। রাষ্ট্রের পরিচ ালক মণ্ডলীরও এটা কাম্য। পৃথিবীর সবদেশে সমাজ গণতন্ত্রীরা এ ধরনের ভূমিকা পালনকরে কার্যত শ্রমজীবী মানুষের স্ব ার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এখানেই লুকিয়ে রয়েছে গত সাতাশ বছরে সচেতনভাবে শাসক দলের চর্চিত অর াজনীতিকরণের রাজনীতি।

পুঁজিবাদী শাসন শোষণে জর্জরিত মানুষ তার নিজস্ব কায়দায় অরাজনীতিকরণের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রক্রিয়াকরণের বিদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কারণ তাঁরাই তো আসল বীর। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এই সময় সংগ্রামে জয় অর্জন প্রায় অসম্ভব। তাই নিরন্তর সংগ্রামে লেগে থাকাটাই বড়। রণজয়ী নয়, রণে আছি তবু মেতে...। মানুষ এই অরাজনীতিকরণের রাজনীতিকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মন্তব্য করেন। বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে এক নতুন চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে --লোকাল কমিটির মেম্বার। সরকার বিরোধী

সংবাদপত্রের বিক্রি দেখলে ঈর্ষা হয়। সম্প্রতি একটি পরীক্ষায় গভীর জলের মাছ এই প্রবচনটি দিয়ে বাক্য রচনা করতে দেওয়া হয়েছিল। দুশো জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দেড়শতাধিক পরীক্ষার্থী লিখেছেন--- রাজনীতিকরা গভীর জলের মাছ, এদের বিশ্বাস করা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির প্রতি সুতীব্র ঘৃণা যদি এটা না হয়, তবে আর কোনটা হবে? আপাতত মনে হয় মানুষ এভাবেই তার প্রতিবাদ জানাবেন যতদিন না সেই শক্তির আবির্ভাব হয় যারা মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে সংগঠিত করে চালনা করবেন সঠিক রাজনৈতিক লক্ষ্যে যা শুধু পাইয়ে দেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষকে তার শোষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াস করবে।আর সময় যখন ডাকিনীর মন্ত্র পড়ে তখন মানুষকে যেভাবেই পারো জাগিয়ে রাখাই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কর্তব্য।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com